বদলে যাচ্ছে মিডিয়া

মিডিয়া অবয়বের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে বাংলাদেশে। সংবাদপত্রে ক্ষুদ্র পুঁজি হটিয়ে জায়গা নিয়েছে কর্পোরেট মানি। শীর্ষ অবস্থানের জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে অবতীর্ণ দৈনিক পত্রিকাগুলো। টেলিভিশন সাংবাদিকতার নতুন ছোঁয়ায় আলোড়ন দেশব্যাপী...

এ নিয়ে লিখেছেন **আশরাফ কায়সার**

রাত এগারোটায় ঢাকা শহর জনশূন্য। যে যার মতো তাড়াহুড়ো করে ঘরে ফিরছে। উদ্দেশ্য একুশে টেলিভিশনে 'রাতের সংবাদ' দেখা। কেউবা সোফায় বসে, কারো হাতে খাবার প্লেট, এখনও বদলাননি বাইরের পোশাক। দোকানের ঝাঁপি বন্ধ করে দোকানি চলে এসেছেন ঘরে। ট্রেন এসে ফিরে যাবে জেনেও। ঠিক সময়ে বসে পড়া চাই টেলিভিশন সেটের সামনে। কী ঘটেছে আজ সারা দেশে তা জানতে হবে, দেখতে হবে।

দেখার মাধ্যম আরো আছে। কিন্তু দেখতে হবে একুশে টেলিভিশনই। কারণ এতে 'সংবাদ' আসে সংবাদের মতো করে। নেই কোনো পোশাকি আয়োজন, নেই ক্ষমতাসীনদের ফিতে কাটা কিংবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রতিযোগিতা। রাজনৈতিক প্রলাপ আছে যতটুকু মানুষ দেখতে চায় ঠিক ততটুকু। আর আছে অনেক প্রশ্ন। ইটিভির রিপোর্টাররা যেতে চান সংবাদের উৎসে, দেখাতে চান খবরের পেছনের খবর। অনিয়ম তুলে ধরে রাখেন প্রশ্ন। আর এতেই দর্শকরা খুশি। ইটিভির আবির্ভাবে গুরুত্ব কমে গেছে বিবিসি বাংলা সার্ভিস রেডিও'র। বিটিভি দেখতে দেখতে আমরা ভুলতে বসেছিলাম টেলিভিশন সাংবাদিকতা বলে কিছু একটা আছে। ইটিভি সেই পথ হাঁটার সূচনা করলো মাত্র। উৎকর্ষে পৌঁছতে এখনো অনেক পথ বাকি।

'পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ' ইটিভি'র নিরপেক্ষতার এখনও কোনো পরীক্ষা হয়নি। সামনে নির্বাচন। রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি ইটিভি-কেও তখন দিতে হবে পেশাদারি মনোভাব ও নিরপেক্ষতার অগ্নিপরীক্ষা। অনেকের সন্দেহ থাকলেও আমার ধারণা ইটিভি এতে উত্তীর্ণ হবে। কারণ প্রতিষ্ঠানটির পেছনে আছেন ব্যবসায়ীরা। তারা জানেন কিভাবে সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয়। সরকারের নিয়ন্ত্রণ কিংবা ক্ষমতাবানদের প্রচ্ছন্ন প্রভাবকে কৌশলে অতিক্রম করাও ব্যবসায়ের একটি কৌশল।

অন্তরে যাই থাক, মুখে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের কথা বলা যে অশোভন তা সরকার ও ক্ষমতাসীনরা এখন ভালোই বোঝেন। আর এ অবস্থা তৈরি করেছে দেশের সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনগুলো। নব্বইয়ে স্বৈরাচার এরশাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়েছে রাতের বেলা সংবাদপত্র অফিসে 'প্রেস এডভাইস' পাঠানো। যাতে বলা হতো কি লেখা যাবে আর কি যাবে না। এক সময় ধারণা ছিল, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সামরিক বাহিনী নিয়ে কিছু লেখা যাবে না। সে নিয়ম ভেঙে বেরিয়ে এসেছে 'ভোরের কাগজ', 'প্রথম আলো' ও 'ডেইলি স্টার'-এর মতো কাগজগুলো। সন্দেহ নেই '৯০-এর পর সৃষ্ট সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত জায়গাটি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। তবে জুজুর ভয় কাটানোর মূল উদ্যোগ ছিল সম্পাদক, সাংবাদিকদেরই। এখন লড়াই অন্য ক্ষেত্রে। আর তা হচ্ছে মালিকের পছন্দ-অপছন্দ আর সাংবাদিক-সম্পাদকদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও 'মাইন্ড সেট'-এর বিরুদ্ধে।

মালিক মাত্রই এখন ব্যবসায়ী। দেশের সবগুলো প্রধান দৈনিক ও সাপ্তাহিকের (দু'একটি ব্যতিক্রম আছে) মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকটি কর্পোরেট হাউস। এদের ক্ষেত্রে একটি বড় সুবিধা হচ্ছে এরা (দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া) সংবাদপত্রকে দেখতে চান ব্যবসা হিসেবেই। তাদের মধ্যে বুদ্ধিমানেরা জানেন কাগজকে স্বাধীনভাবে চলতে দিলে এর প্রচার সংখ্যা বাড়বে। আর প্রচার বাড়লেই সমাজে মালিকের প্রভাব বাড়বে। দরকার কি প্রতিদিনের খুঁটিনাটি বিষয়ে নাক গলানো। আর যারা অতিবুদ্ধিমান তারা সংবাদপত্রকে চান প্রতিদিনের ব্যবসায়ীক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে। যার পরিণাম নিশ্চিত ভরাডুবি। সাম্প্রতিক সময়ে বেক্সিমকোর মিডিয়া উদ্যোগগুলোই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, নিউজ এজেন্সি সবগুলোই একসঙ্গে বাজারে এনেছিল বেক্সিমকো। এখন হাতে গোনা যায় একমাত্র 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট'কে। বাকিগুলো নিভে যাওয়ার পরই জানা যাচ্ছে সেটি জ্বলছিল। যেমন দু'সপ্তাহ আগে 'মুক্তকণ্ঠ' বন্ধ হলো বাজারে খবর করে। গণমাধ্যম নিয়ে কাজ করেন এমন কেউ অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের কোনো ছাত্রের জন্য একটি চমৎকার গবেষণার বিষয় হতে পারে বেক্সিমকোর মিডিয়া উদ্যোগ। কেন প্রতিষ্ঠানটি মিডিয়া ব্যবসায় নেমেছিল, কোন ভুলের কারণে উদ্যোগ ভেঙে গেল আর মালিকদের নিজস্ব উপলব্ধিই বা কি? পাশাপাশি তুলনা করা যেতে পারে কোনো একটি সফল মিডিয়া হাউসকে যাদের প্রকাশনা সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। এই গবেষণাপত্রটি দেশের গণমাধ্যমের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে চিহ্নিত করতে পারে। যা থেকে নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবেন মিডিয়াতে কর্মরতরা ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারীগণ।

একুশে টেলিভিশনের সাফল্যের পর এখন অনেকেই টেলিভিশন চ্যানেলে বিনিয়োগের কথা ভাবছেন। এদের মধ্যে দু'একজন আছেন যারা সফল সংবাদপত্রের মালিক। সরকারি ঘোষণায় জানা গেছে, আরো দুটি চ্যানেল আসছে যাদের নিউজ পরিবেশন করার অনুমতি

দেয়া হয়েছে। তার মানে ুব শিঘ্রই এ ুশে টেলিভিশনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হবে। যে মনোপলি ইটিভি এখন উপভোগ করছে তা ুব বেশিদিন ধরে রাখা যাবেনা।

বিটিভি'র মতো একটি দেশবিস্তৃত টেলিভিশন থাকার পরও ইটিভিকে মনোপলি বলার কারণ হচ্ছে চ্যানেলটি উঠে এসেছে সংবাদ পরিবেশন করে। যে ক্ষেত্রে বিটিভি ইটিভির প্রতিদ্বন্দ্বি তো নয়ই, বরং তা হচ্ছে একটি বস্তাপচা সরকারি প্রোপাগান্ডা মেশিন। মানুষ বিটিভির সংবাদকে নিউজ না ধরে মনে করে সরকারি ভাষ্য। যেন একটি রোবট ভাবলেশহীনভাবে আধঘণ্টা ধরে পড়ে যান ক্ষমতাসীনরা কে কোথায় কি করেছেন। তাই টেলিভিশন দর্শকদের নিউজ ুধা ছিল পূর্ণমাত্রায়। আর এই ক্ষুধা মেটাবার আহার দিচ্ছে ইটিভি। মা ুষ খাচ্ছেও তা গো াসে। পোশাক-পরিচ্ছদ ও হাত নাড়ার ভঙ্গি। সবাই জানেন ছবি অনেক কথা বলে। আর তা যদি জীবন্ত হয় তবে তো কথাই নেই। ইটিভি'র কল্যাণে জীবন্ত ছবি থেকে ুখোশের আড়ালের মা ুষটিকে চেনা অনেক সহজ হচেছ জনগণের জন্য। এতোসব সুসংবাদের পাশাপাশি ইটিভি'র জন্য একটি দুঃসংবাদও আছে। তা হলো ুধা কিছুটা নি ৃত্ত হওয়া র পর মানুষ যেমন খাবারের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে তেমনি প্রশ্ন উঠছে ইটিভি'র নিউজ নিয়েও। মনে হচ্ছে এ যেন সবকিছু ুঁয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ঢুকছে না। সংবাদ চলুক সংবাদের মতো। সেই সঙ্গে সংবাদ পর্যালোচনা চাই। দেখতে চাই ঝড় তোলা রাজনৈতিক বিতর্ক, মাঠ গরম করা রাজনীতিকের সাক্ষাৎকার। মানুষের চোখ খুলে দিচ্ছে বাইরের চ্যানেল বিবিসি, সিএনএন এমনকি ভারতের বাংলা চ্যানেলগুলো। ইটিভি-কে মাথায় রাখতে করলেও নাটক কিংবা অন্যান্য বিনোদনমূলক অ ুষ্ঠানে বিটিভি ও চ্যানেল আই এর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। বিটিভির বিনোদন অনুষ্ঠান বা নাটক এখনও একটি মান ধরে রেখেছে। প্রতিযোগিতায় টিকতে বিটিভি তৈরি করছে আগাম পরিকল্পনার। বিশেষ দিবসে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর আয়োজন চলছে ইটিভি'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর সমস্যা হচ্ছে এদের দৌড় খুব সীমিত এলাকায়। শুধুমাত্র শহরাঞ্চল ও বড় মফস্বল টাউনগুলোতেই স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখা যায়। যেখানে বিটিভি কিংবা ইটিভি ৌছে যাচ্ছে দেশের ৯৩% গ্রামে। ১৯৯৮ সালের ন্যাশনাল মিডিয়া সার্ভে (করেছে ওআরজি-মার্গ-কোয়েস্ট) অনুযায়ী ৪২% মানুষের কাছে পৌঁছে টিভি সম্প্রচার । আর এ কারণে টেলিভিশনই দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী মিডিয়া। তারপরই আছে রেডিও'র স্থান। যার বিস্তার ৩৯% মানুষের কাছে। শিক্ষার হারের নিচু অবস্থানের কারণে এদেশে সংবাদপত্র যায় মাত্র ১৫% মানুষের কাছে আর ম্যাগাজিন মাত্র ৪%-এর কাছে।

রাত এগারোটায় ঢাকা শহর জনশূন্য... মানুষ একুশে টিভি'র সামনে

তবে বিস্তার যতই হোক, রেডিও'র এখন বড়ই দুর্দিন। টেলিভিশনের গ্ল্যামার-এর কাছে রেডিও পরাজিত হয়ে হারিয়েছে এর সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা। বর্তমান সরকারসহ বিগত সব সরকারই টেলিভিশন দখল করে নিজেদের ছবি দেখানোয় উৎসাহ দেখিয়েছে শত নিন্দিত হয়েও। রেডিও থেকেছে অবহেলিত। এর চাকচিক্য নেই। তাই এর পেছনে নেই কোনো উন্নয়নের পরিকল্পনা। ভারতের মিডিয়া সমালোচক আমিতা মালিকের কথাই যেন সত্য, 'রেডিও অবহেলিত হয় মধ্য বয়স্ক প্রথম স্ত্রীর মতো, যখন টেলিভিশনকে যৌবনা দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে লুফে নেয়া হয় সাগ্রহে'। অথচ রেডিও যে কত কার্যকরী মাধ্যম তার সর্বশেষ প্রমাণ পাওয়া গেছে এ বছরের জানুয়ারিতে গুজরাট ভূমিকম্পের সময়। বহির্বিশ্বে এমনকি ভারতের কেন্দ্র ও অন্যান্য অঞ্চলে ভূমিকম্পের খবর প্রথম প্রচারিত হয় রেডিও'র মাধ্যমে। রেডিও-ই ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে দশ মিনিট অন্তর স্পেশাল বুলেটিন প্রচার করে। বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেয় দুর্গত মানুষের বাণী ,

এতদিন দেশের রাজনীতিপ্রিয় মানুষ রাজনীতির সংবাদ শুধুই পড়তে পাড়তো। কিছু দেখতে পেতো না। এখন দেখতে পাচ্ছে এবং আলোচনা করছে কেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম রমনা বটমূলে বোমা হামলা সংক্রান্ত সন্ধ্যায় এত ঘামছিলেন। তার বাসায় কি এয়ারকন্ডিশন কাজ করছিল না? নাকি তিনি ক্যামেরার সামনে এমন কিছু বলছিলেন যার পরিকল্পনা করতে গিয়ে তার ঘাম ছুটে যাচ্ছিল। ইটিভি'র ক্যামেরায় ধরা পড়ছে ক্ষমতাবান, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের কথা বলা, হবে শহর এলাকায় এই চ্যানেল যায় ক্যাবল নেটওয়ার্কে করে। যেখানে রিমোট কন্ট্রোলের এক বাটন পুশেই ধরা যায় বিবিসি নিউজ কিংবা হার্ডটক। দেখা যায় সিএনএন-এর ল্যারি কিং লাইভ। বোঝা যায় বিবিসিতে প্রণয় রায়-এর কোশ্চেন টাইম ইন্ডিয়ার প্রশ্নের পেছনের প্র ্ন।

এতো গেল নিউজ ফ্রন্টে ইটিভি'র চ্যালেঞ্জ। বিনোদনে বিটিভি, চ্যানেল আই কিংবা এটিএন বাংলার সঙ্গে ইটিভি'কে লড়তে হবে ভালোই। নিউজ দিয়ে ইটিভি মাঠ গরম

সাহায্যের তীব্র চিৎকার। একই অবস্থা দেখা যায় যখন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় হয়, আঘাত হানে জীবনহানার সাইক্লোন। তখনও মাছ ধরার ট্রলারগুলো ও উপকূলবর্তী মানুষের একমাত্র নির্ভর রেডিও। রেডিও'র মতো এতোটা কার্যকরী মিডিয়াও এদেশে শ্লথ হয়ে যাচ্ছে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও অবহেলায়। আওয়ামী লীগ সরকার 'মেট্রো ওয়েভ' নামে একটি রেডিও স্টেশনকে অনুমতি দিয়েছে ঢাকা শহরে কার্যক্রম চালানোর জন্য। নাগরিক জীবনের টিপ্‌স ও সঙ্গীতমালাসহ রেডিওটি চলছেও বেশ। এরকম আরও অনেক স্টেশন খোলার ছাড়পত্র দেয়া দরকার। ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যামে প্রতিদিন যত কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়, যত জ্বালানি তেল পোড়ে, যা ক্ষতি হয় অর্থনীতির— তার এক হাজার ভাগের এক ভাগ বিনিয়োগে একটি রেডিও স্টেশন হতে পারে। যার কাজ হবে শহরের ট্রাফিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরাখবর দেয়া। কোন্ রাস্তায় যাবেন, কোন্ রাস্তায় যাবেন না। পৃথিবীর সব বড় শহরেই একাধিক এফএম রেডিও এসব সার্ভিস দেয় ও জনপ্রিয় সংগীতমালা প্রচার করে। এদেশে সরকার রেডিওকে কুক্ষিগত করে রেখে এর বিকাশ হতে দিচ্ছে না। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম।

সরকার মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করবে না। এটি শুনতে যতই ভালো শোনাক না কেন, এদেশের রাজনীতিবিদগণ মন থেকে এটি বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই যখনই যে দল ক্ষমতায় যায় টেলিভিশন- রেডিও পরিণত হয় দলীয় কিংবা ব্যক্তির প্রচার যন্ত্রে। আওয়ামী লীগ '৯৬এর নির্বাচনে জনগণের ভোট পেয়েছিল রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও সংবাদপত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। প্রতিশ্রুতির কিছু অংশ এরা তড়িঘড়ি করে বাস্তবায়ন করেছে।

এক সময়ের দৈনিক বাংলা-টাইমস ট্রাস্ট বলে এখন কিছু নেই। বের হয় না সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো পত্রিকা। সংবাদপত্র প্রকাশনা থেকে সরকারের সরে আসার সিদ্ধান্তটি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। তবে প্রশ্ন উঠেছে, শেখ রেহানার হাতে কি করে এক সময়ের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'র মালিকানা গেল? এ জন্য কি কোনো ওপেন বিড আহ্বান করা হয়েছিল? নাকি পুরো প্রক্রিয়াটির পেছনেই কাজ করেছে ক্ষমতাবান দু'একজনকে লাভবান করার উদ্দেশ্য।

ম্যাগাজিনে এসেছে চাকচিক্য আর শোভন উপস্থাপনার প্রতিযোগিতা

বর্তমান সরকার সংবাদপত্র থেকে পুঁজি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটি খুব অল্প সময়ে নিলেও, রেডিও টেলিভিশনকে 'স্বায়ত্তশাসন' দিতে কোনোভাবেই চাচ্ছে না। আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে '৯৬ সালে। এখন ২০০১। আর ৫০ দিন পরই ক্ষমতা ছাড়তে হবে এদের। অথচ এখনও বিষয়টি মীমাংসিত নয়। সংসদে বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসন বলে সম্প্রতি যে বিল আনা হয়েছে, তা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিলটির মূল কথা হচ্ছে, বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসন দেয়া হলেও দু'টি আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এরা অস্তিত্ব বজায় রাখবে। তাদের প্রধান নির্বাহী ও পাঁচ সদস্যের নির্বাহী পরিষদকে সরকারই মনোনয়ন দেবে এবং সরকার যে কোনো সময় তাদের বরখাস্ত করতে পারবে। সরকার অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে।

প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য গত এক দশক ছিল ঘটনাবহুল। এ মুহূর্তে দেশে যে কয়টি সংবাদপত্র বেশি সার্কুলেশনের অধিকারী তার মধ্যে ইত্তেফাক ছাড়া বাকি সবগুলোরই জন্ম গত দশকে। এক সময়ের নামকরা পত্রিকাগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে এ জগৎ থেকে। এগুলোর জায়গা নিচ্ছে নতুন নতুন সব সংবাদপত্র। যার আকার, কলেবর ও মেকআপে অনেক নতুনত্ব। চারদিকে রঙের ছড়াছড়ি। নিউজ স্ট্যান্ডে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে অনেক কাগজ। চাকচিক্য আর শোভন উপস্থাপনার প্রতিযোগিতা।

এই পরিবর্তনের নেপথ্যে আছে পুঁজির চরিত্র। সংবাদপত্র এখন আর কুটির শিল্প হিসেবে প্রকাশ হয় না। হলেও প্রতিযোগিতায় তার অবস্থান নড়বড়ে। কর্পোরেট মানি ঢুকে গেছে পত্রিকাগুলোয়। সংবাদপত্র এখন বড় বিনিয়োগের ব্যাপার। নব্বই দশকের শুরুতেও একটি দৈনিক প্রকাশে ২ কোটি টাকা বাজেট ধরা যেত। দশকের শেষে এসে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ২০ কোটি টাকা। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কারো পক্ষেই এখন পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেকে পত্রিকা কবে লাভজনক হবে সে বিবেচনা না করেই অঢেল অর্থ বিনিয়োগ করছেন সর্বোচ্চ সার্কুলেশনে যেতে। যুক্তি হল, লাভ না দিক, ক্ষমতা তো দেবে।

কর্পোরেট মানি বদলে দিচ্ছে সংবাদপত্র অফিসগুলোর অবস্থান ও চেহারা। এখন আর পত্রিকা অফিস খুঁজতে গলি-ঘুপচিতে যেতে হয় না। শহরের প্রধান সড়কে বিশাল সব অট্টালিকায় পত্রিকা অফিসের অবস্থান। সেখানেও জায়গার সংকুলান না হলে সিঙ্গাপুর থেকে চলে আসছে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড স্ট্রাকচার। তিন মাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আধুনিক টিনের ঘর। সেখানে স্থান নেই ষাট কিংবা সত্তর দশকে দেখা হতদরিদ্র পত্রিকা অফিস মার্কা অভ্যন্তরীণ অফিস বিন্যাসের। সে জায়গায় এসেছে আধুনিক ইন্টেরিয়র ডিজাইনারের করা নান্দনিক ডিজাইন।

অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে কর্পোরেট মানি নিয়ে এসেছে প্রতিযোগিতা। যেভাবেই হোক সার্কুলেশন শীর্ষে উঠতে হবে, বলতে হবে আমরাই শ্রেষ্ঠ। এ মুহূর্তে দাবি করছে তিনটি পত্রিকা জনকণ্ঠ, প্রথম আলো ও যুগান্তর দাবি করছে প্রচার সংখ্যায় তারাই শীর্ষে। প্রথম আলো অনেক দিন থেকেই প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপছে তাদের প্রিন্ট অর্ডার। এ ধারায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে যুগান্তর। যারা শুধু প্রিন্ট অর্ডার নয় কোন্ কোন্ জেলায় কাগজটি প্রচারে শীর্ষে ছেপে দিয়েছে তাও। জনকণ্ঠ কয়েক বছর আগেই তাদের মাস্ট হেডের উপরে যোগ করেছে 'প্রচার সংখ্যায় শীর্ষে' কথাটি। মাঝে জনকণ্ঠ ও যুগান্তরের বেশ কয়েকদিন কলম যুদ্ধ চলেছে কে কার ওপরে সে বিতর্ক নিয়ে। দেশের প্রবীণ দৈনিক বলে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত 'ইত্তেফাক' এখনও এ যুদ্ধে নীরব। দেশে সাকুল্যে পত্রিকা চলে ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখের মতো। পাঁচ জন করে পাঠক ধরা হলেও মোট পাঠক মাত্র ৫ মিলিয়ন যা ১২৮ মিলিয়ন মানুষের দেশে খুবই কম।

সার্কুলেশন নিয়ে পত্রিকাগুলোর মধ্যে যুদ্ধ এদেশে এবারই প্রথম। এটা হওয়া দরকার ছিল আরো আগেই। ভাবার কোনো কারণ নেই নতুন সংবাদপত্রগুলো নতুন পাঠক

তৈরি করে বিকশিত হচ্ছে। যে কাগজগুলোর সার্কুলেশন বাড়ছে তারা নিশ্চিতভাবেই কোনো না কোনো পুরনো কাগজের পাঠক টানছেন। একমাত্র ট্যাবলয়েড দৈনিক 'মানবজমিন'ই সাম্প্রতিক সময়ে নতুন ক্রেতা-পাঠক তৈরি করেছে। রিক্সাওয়ালা এমনকি ফুটপাতের হকাররাও পত্রিকাটি কিনছেন এর চাঞ্চল্যকর নিউজ ভঙ্গির কারণে। কোন কাগজ কত চলে সেটা জানা দরকার বিজ্ঞাপনদাতাদের, এজেন্সিগুলোর ও মিডিয়া পরিকল্পনাকারীদের। পৃথিবীর সব সভ্য দেশেরই এ সংখ্যাগুলো সর্বস্বীকৃত। উন্নত বিশ্বের মতো এ দেশেও সার্কুলেশন পরিমাপের সংস্থা অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন (এবিসি) আছে। তবে কাজকর্মে এটি অথর্ব ও নিষ্ক্রিয় একটি প্রতিষ্ঠান। যে কাগজ রাজধানীর দেয়ালে ছাড়া আর কোথায়ও দেখা যায় না এবিসির হিসাবে তার সার্কুলেশন লক্ষাধিক। বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর কাছে পত্রিকার সার্কুলেশনের একটি সংখ্যা থাকে যার পাশে লেখা হয় 'দাবিকৃত'। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। সুসংবাদ যে, এখন সংবাদপত্রগুলোই নিজেদের স্বার্থে দাবি তুলেছে নিরপেক্ষ সংস্থা কর্তৃক সার্কুলেশন নিরূপণ করার। এ ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ নেয়া দরকার তাড়াতাড়ি। সার্কুলেশন নিরূপণ কমিটিতে আমলা ছাড়াও থাকা দরকার সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী প্রতিনিধিত্ব। এবিসি রিপোর্টের ভিত্তিতেই হওয়া দরকার নিউজ পেপার ও সরকারি বিজ্ঞাপন বন্টন। বেসরকারি বিজ্ঞাপন দাতারাও স্বচ্ছ সংখ্যার ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে পারবেন তাদের নীতি। এই বিষয়গুলোর কারণেই বেশি সার্কুলেশনের কাগজগুলো সার্কুলেশন বলতে যতটা আগ্রহী, ঠিক ততটাই অনাগ্রহী কম সার্কুলেশনধারীরা।

দৈনিক পত্রিকাগুলোর সার্কুলেশন প্রতিযোগিতায় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনেকেই জানেন না তা হলো এদের মধ্যে নতুন জন্ম নেয়া বেশি সার্কুলেশনের প্রায় সব কয়টি কাগজই ভর্তুকি দিয়ে চলছে। নিউজ পেপার ম্যানেজমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংক হচ্ছে পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে না থাকলে তা ভর্তুকি দিতে বাধ্য। এটা আরও বাড়ে যখন পত্রিকার সার্কুলেশন ছুটতে থাকে শীর্ষ স্থানে। তখন প্রতি কপি ছাপা ও কাগজের খরচও উঠে আসে না এর বিক্রিত মূল্য থেকে। আর এ হিসেবেই যুগান্তর ও প্রথম আলোকে সার্কুলেশন বাড়ানোর পাশাপাশি নজর দিতে হচ্ছে ভর্তুকি কমানোয়।

দৈনিক পত্রিকাগুলো এখন 'নিউজপেপার বিয়ন্ড নিউজপেপার'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ। সব বড় পত্রিকাই সংবাদ পরিবেশনার বাইরে আরো বেশি কিছু দিতে চাচ্ছে পাঠককে, পালন করছে সামাজিক দায়িত্ব। অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে ও মানবতার পক্ষে কণ্ঠ তুলেছে প্রথম আলো-জনকণ্ঠ-যুগান্তর সহ অনেক কাগজ। জনকণ্ঠের এক রিপোর্ট বাঁচিয়ে দিয়েছে ওয়াইল্ড পোলিও আক্রান্ত কিশোর অমিতকে। সাংবাদিক টিপু সুলতানের চিকিৎসা ও এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে তহবিল গঠন ও জনমত গড়ে প্রশংসিত হয়েছে প্রথম আলো। এসব ভূমিকায় মানুষ সংবাদপত্রকে দেখতে পাচ্ছে নতুন আলোয়।

সংবাদপত্রগুলোর প্রতিযোগিতা এর চরিত্রেও পরিবর্তন এনেছে অনেক। দৈনিকগুলো এখন শুধু কড়কড়ে নিউজ নয়, ফিচারাইজড বিষয়েও সমান মনোযোগী। এ পরিবর্তনের শুরু '৯১ সালে 'আজকের কাগজ'-এর মাধ্যমে। সংবাদপত্রে বিষয় ও ট্রিটমেন্টের এ পরিবর্তনে 'জনকণ্ঠ' যোগ করে প্রযুক্তির উৎকর্ষ। এখন যে কোনো দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই বের হয় বিষয় ভিত্তিক 'বাচ্চা ম্যাগাজিন'। এমনকি ইত্তেফাক, সংবাদ-এর মতো প্রবীণ কাগজকেও এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চরিত্রে ও বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। দৈনিকগুলো সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি মনোযোগী হয়েছে ফিচার, বিশেষ সংখ্যা, গোলটেবিল, কার্টুন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, সাময়িকী ও ঘর-গেরস্থালির সার্ভিস দিতে। আর এ জায়গাটিতেই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে দেশের সাপ্তাহিকগুলো। সপ্তাহ শেষে মানুষ যা প্রত্যাশা করে তেমন আইটেম দৈনিক পত্রিকাগুলোই সাপ্তাহিকের মতো করে পরিবেশন করছে। এ অবস্থায় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনগুলোর কৌশল পরিবর্তন ছাড়া উপায় নেই। সংবাদপত্রের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিষয় বের করে আনা অথবা কোনো বিষয়ের গভীরে যেয়ে তা বিশ্লেষণ করাই সাপ্তাহিকের টিকে থাকা ও উৎকর্ষ লাভের উপায়। এ কাজ কোনো দৈনিককে দিয়ে কখনো সম্ভব নয়।

এ কাজটি সঠিকভাবে করার কারণেই বিশ্বের নাম করা সাপ্তাহিকগুলো দৈনিকের ব্যাপ্তি ও সাইবার জার্নালিজমের উত্থানের পরও টিকে আছে এবং আরো বিস্তৃত হচ্ছে। পাশের দেশ ভারতে ইন্ডিয়া টুডে'র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গত কয়েক বছরে উঠে এসেছে নতুন সাপ্তাহিক 'আউট লুক', 'দ্য উইক'। ইন্ডিয়া টুডে প্রচার করে ভারতে তাদের কাগজই সর্বাধিক পঠিত। ৫ লাখ সার্কুলেশনের ইন্ডিয়া টুডে তাদের রিডারশিপ ধরে আটজন করে আর প্রতি সংখ্যার সেল্‌ফ লাইফ হচ্ছে সাতদিন। এ হিসেবে যে কোনো দৈনিকের চেয়ে সাপ্তাহিক যে প্রভাবশালী হতে পারে তা বলা বাহুল্য। কিন্তু এদেশে সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনগুলো এ ধরনের কোনো আন্দোলন এখনও গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে বিনিয়োগকারীরাও সাপ্তাহিক প্রকাশনায় বিনিয়োগের চেয়ে বেশি মনোযোগী দৈনিকের দিকে। যাতে ইমিডিয়েট রিটার্ন খুব সহজে চোখে পড়ে। তাই সাপ্তাহিক বা ম্যাগাজিন বিকাশের এক বিপুল সম্ভাবনা এদেশে এখনও সুপ্ত হয়ে আছে। হঠাৎ করে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' বন্ধ হওয়ায় এ সংকট আরো তীব্র হয়েছে। সাপ্তাহিক ২০০০, যায় যায় দিন, হলিডে এদেশে সাপ্তাহিকের অমিত সম্ভাবনার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র কাজে লাগাতে পেরেছে।

অনেকের মতে, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন এ দেশে কম চলার আরেকটি কারণ মানুষের পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। টেলিভিশন দেখতে কোনো শ্রম দিতে হয় না। সুইচ অন করে বসে পড়লেই হলো। নিউজ পেপার পড়তে লাগে অবসর সময়, মনোযোগ। কথাটি আমাদের তরুণদের জন্যে যে বেশ সত্যি তা বলা যায়। এদের আকর্ষণ এখন কম্পিউটার ম্যাগাজিন ও ইন্টারনেটের প্রতি। তবে গত কয়েক বছরে ইন্টারনেট প্রমাণ করেছে বিকল্প মিডিয়া হিসেবে এর সর্বস্বীকৃতি এখনও অনেক দূরের বিষয়। তেহেলকা ডট কম-এর মতো কোনো ঘটনা না ঘটালে এদেশের বাংলাদেশ ইনফো ডট কম, হোম ভিউ বাংলাদেশ ডট কম কিংবা ওয়েব বাংলাদেশ ডট কমের মতো নিউজ পোর্টালগুলো এখনই আলোচনায় আসছে না। তাই এদেশে নতুন অর্থনীতির দুই শক্তিশালী মিডিয়া হচ্ছে টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়া। এ দু'য়ের হাতেই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্য।